ডা. (ক্যাপ্টেন) আবুল কাসেম
স্মরণে

ডা. (ক্যাপ্টেন) আবুল কাসেম
স্মরণে

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সম্পাদিত

সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ

প্রকাশক :

সৈয়দা কমর জাবীন
সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ
'আশায় বসতি'
৬০/২ উত্তর ধানমন্ডি
কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল :
জুলাই ২০১৫

মুদ্রণ :
গণমুদ্রণ লিমিটেড
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১৩৪৪

নিবেদন

মরহুম ডা. ক্যাপ্টেন আবুল কাসেম শুধু রাঙ্গুনীয়া তথা চট্টগ্রামের নন, বরং বাংলাদেশের এক বরেণ্য সন্তান। তাঁর ইন্তেকালের অব্যবহিত পর একটি স্মরণিকা প্রকাশের কথা আমরা ভাবি। এ বিষয়ে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে অবহিত করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে ডিকটেশন দিতে থাকেন। এভাবে 'স্মরণে' লেখা হয়। দুর্ভাগ্যবশত স্মরণিকা প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটে যায়।

যাহোক, ডা. কাসেমের নাতনী-জামাই জনাব শামছুজ্জামানের একটি তথ্যবহুল রচনা ও দুটি কবিতা ছাপা হলো। এছাড়া পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আমিও কিছু লিখলাম।

উল্লেখ্য যে, আরবীতে 'কাসেম' অর্থ 'বন্টনকারী' এবং 'হাশেম' অর্থ 'নম্র', 'শিষ্টাচার' ইত্যাদি। বাংলায় উচ্চারণ ও বানানে ভিন্নতা দেখা যায়। আমরা শুদ্ধ করে দেবার প্রয়াস নেইনি।

ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদায় ১৯৭০ সালে নির্বাচন উপলক্ষে 'রাঙ্গুনীয়ার কৃতি সন্তান' শীর্ষক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাও আদ্যোপান্ত সন্নিবিষ্ট করা হলো।

৯ জুলাই, ২০১৫ — মাহমুদ শাহ কোরেশী

সূচিপত্র

স্মরণে – সৈয়দ আলী আহসান	৫
স্মরণে – মোহাম্মদ শামছুজ্জামান	৭
বড় মামা – মাহমুদ শাহ কোরেশী	২২
'রাঙ্গুনীয়ার কৃতি-সন্তান' নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকা	৩১
বঙ্গবন্ধুর আবেদন	৩৬

চিত্রসূচি

ডা. আবুল কাসেম প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ	৩৭
ছাত্রাবস্থায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই	৩৮
বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বজনদের মধ্যে ডা. কাসেম	৩৯
পারিবারিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও ডা. কাসেম	৩৯
মিসেস কাসেম ও নাতনী জুলি	৪০
মিসেস কাসেম ও পুত্র মাহবুবুল আলম সেলিম	৪০

স্মরণে

সৈয়দ আলী আহসান

ডাক্তার আবুল কাসেমকে আমি জানতাম একজন ধর্মপ্রাণ রাজনীতিবিদ হিসাবে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনিই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। আলোচনার সময় তিনি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তার আগে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, তা নিয়ে আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তাতে বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর মানসিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যদিও রাজনীতি করতেন, কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মত ছিলেন না। তিনি সরল মানুষ ছিলেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে মিশতেন। আমার রাজনৈতিক চিন্তা কী ছিল, তা নিয়ে তিনি কখনও প্রশ্ন করেননি। আমার কন্যার বিবাহসূত্রে তিনি আমার আত্মীয় ছিলেন এবং এই আত্মীয়তার বন্ধন তিনি সবসময় সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করতেন। চট্টগ্রামে তাঁর সময়ে অনেক রাজনীতিবিদ ছিলেন কিন্তু তাঁদের সাথে তাঁর যে সমন্বিত চিন্তা ছিল তা নয়। তিনি আত্মভোলা লোক ছিলেন এবং সকল মানুষকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্বাসের পরিমন্ডল এত ব্যাপক ছিল যে, সকল শ্রেণীর লোক তাতে স্থান পেত। হাসিমুখে তিনি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন এবং সকল সময় তাঁর মুখে একটি সহজ আনন্দের ভাব প্রকাশ পেত। যখন শেষের দিকে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে যায়, সে সময় তিনি ঢাকায় এসেছিলেন তাঁর নাতনীর বিবাহের দাওয়াত দিতে। সে সময় তিনি বেশ অসুস্থ। আমার বাড়িতে এসে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন এ বিয়েতে আমি যেন যাই। তিনি অসুস্থ শরীরে এতদূর পর্যন্ত এসেছেন, এটা ভেবে আমি খুব

অবাক হলাম। তাঁর ছেলে বা অন্য কেউ বিয়ের ফর্দ নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন : আপনাকে বিয়ের ফর্দ দেওয়া বড় কথা নয়, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটাই বড় কথা। নিজের দলের হোক বা ভিন্নদলের হোক সবাই তাঁকে নীতিবান বলে শ্রদ্ধা করত। তাঁকে যখনই দেখেছি, তখনই তাঁকে শান্ত অথচ উদাসী মানুষ বলে আমার মনে হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে সেগুলির সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, বরং জনসাধারণের সমষ্টিগত লাভের জন্য তিনি এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর সমতুল্য মানবহিতৈষী লোক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু হারিয়েছি।

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১

স্মরণে

ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডা. আবুল কাশেম : চরণ ধুলায় ধূসর হব

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান

নিজ পেশার বলয়ে কিংবা মানবিক সংহতি ও সঙ্কটে জীবনের সিংহভাগ সময়ে আর্ত-পীড়িতের যে সেবা করেছেন, জীবনের ঠিক শেষলগ্নে সেই সেবা নিতে তিনি শেষশয্যা পাতলেন চট্টগ্রামের খুলশী'র 'হলি ক্রিসেন্ট' হাসপাতালে। আমাদের প্রাণপ্রিয় 'দাদুভাই' বসন্তের প্রলম্বিত সন্ধ্যার রাগিণীর পর বর্ণময় জীবনে সূর্যের মতো পাটে বসলেন। তা যেন দীর্ঘদিনের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা জগতে বেঁচে থাকার ক্লান্ত জীবনে শ্রান্তিমোদনের প্রয়াস। সাত্ত্বিক জীবনের উন্মেষ ও বিলয়ের মাঝে প্রগাঢ় সৃষ্টির অভিক্ষেপ মূর্তিমান হয় সবার মাঝে নানা দ্যোতনায়। হতে পারে তা আপনজনে, গোষ্ঠীবদ্ধতায়, জীবন পদচারণার সংঘবদ্ধতার নানা গণ্ডীতে বেজে ওঠে ভিন্নসুরে, নিবেদনের ভিন্নতায়। ক্যাপ্টেন ডা. আবুল কাশেম-এর সুদীর্ঘ জীবনের বর্ণিল সরোবর উছলে পড়ে, তা যেমন বহুমুখী, তেমনি বৈচিত্রময় বটে। প্রায় ঊননব্বই বৎসরের বর্ণিল রঙধনু'র অভিক্ষেপের ক্লান্ত শেষ দশকের প্রগাঢ় রক্তিম ভালবাসায় মাখামাখি, এক স্বজন হয়ে ওঠার মুগ্ধতায় ভর করা। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়াস অপূর্ণকে পূর্ণতা দানের মহত্বে মহান জীবনের প্রতি জয়গানের শুধু কৃতজ্ঞতা কীর্তন না, এক বড় মাপের মহীরুহকে সামনের সারিতে এনে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনের প্রচেষ্টা মাত্র।

ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডা. কাশেম-এর জন্মকাল এবং চট্টগ্রামের শিক্ষাজীবনের সময়টা পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাঙালি জীবনের স্বাধিকার আন্দোলনের আঁতুড় ঘর পর্যায়ের পাঠ চুকিয়ে

বিকাশমান অধ্যায়। ডা. কাশেমের জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়ায়, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩৪-৩৫ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে কোলকাতায় গমন–যৌবনের প্রারম্ভে চট্টগ্রামে অবস্থান, শিক্ষার্থী অবস্থায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর মতো মেধাবীদের চেতনাসমৃদ্ধ মানসপট গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। সে সময়কার সাহচর্য ও প্রতিবেশের প্রভাব একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ ১৯২৫ হতে পরবর্তী দশ বৎসর কেমন ছিল চট্টগ্রাম শহর ও তার সন্নিহিত জনপদ। অবশ্যই স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত কড়াই, বারুদে ভরা জনপদ। ১৮১৭ সালে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় স্নাত বাঙালি হিন্দুরা রেনেসাঁসিক্ত এক উন্নত জনগোষ্ঠী। জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধুনিকতার উত্তরণে বাঙালি হিন্দুরা সেসময় সমগ্র ভারতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতসহ জ্ঞানীজন, প্রশাসন, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক সর্বক্ষেত্রে শিক্ষায় আলোকিত হিন্দু জনগোষ্ঠী বিরাজমান। পিছিয়ে-পড়া অভিমানি বাঙালি মুসলমানরা এসময় একটু একটু করে ধর্মীয় শিক্ষার অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট। কিন্তু ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯২৬ সালে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার সুফলের ঢেউ তখনো চট্টগ্রামে আছড়ে পড়েছে একথা কবুল করা যায় না। তাই ডা. কাশেমের যৌবনের বিকাশমান অবস্থা অর্থাৎ চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া কোলকাতা হিন্দু কলেজ, মহিলাদের বেথুন কলেজ কালচারে প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবে সেটাই ছিল। বিপ্লবী সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থা ও বিপ্লববাদের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম রণক্ষেত্রে পরিণত। এসব বিপ্লবীদের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের উষ্ণ আঁচ তরুণ কাশেমের গায়ে লেগেছিল।

সপ্রতিভ কাশেমের ক্লাশমেট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বিপ্লবী লোকনাথ বল। বিপ্লবীরা সেই সময়ের পাঁচজন মুসলমান ছাত্রকে সম্ভাব্য সহকারী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়। আবুল কাশেম তাঁদের অন্যতম। অন্য একজনের নাম জানা যায়, তিনি সন্দ্বীপের মোজাম্মেল হক। চট্টগ্রাম কোর্টের মহাফেজ পিতা আবুল হাশেম তদবির করে পুলিশের তালিকা থেকে ছেলের নাম বাদ দিয়ে বদলী

নিয়ে ময়মনসিংহ চলে যান। জানা যায়, বিপ্লবীদের সংস্রবের সময় তিনি শরীরচর্চা ছাড়াও এস্‌রাজ বাজানোর প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রায় এক বৎসরের বিপ্লবীদের সাহচর্য বাকী জীবনে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে গড়ে উঠতে প্রভাব রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কিছুদিন পর চট্টগ্রামে ফিরলেও দূর থেকে উপলব্ধি করা ছাড়া পথ ছিল না। প্রথম প্রজন্মের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে ও প্রতিষ্ঠার তাড়নায় উপলব্ধির জগতটা সীমিত রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া পিতা মৌলবী আবুল হাশেমের তৎপরতা ও নির্দেশনায় কাশেমকে বিপ্লবী জগতের বিস্ময় বেশী দূর টানতে পারেনি। প্রখ্যাত বাঙ্গালী নেতা ও চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সন্তান মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মাস্টার'দা সূর্যসেন এর সমকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সেসময়কার ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে চট্টগ্রামের অংশগ্রহণ সারা বাংলার প্রতিচিত্র, মুসলিমদের সম্পৃক্ত না করা বা সম্পৃক্ত না হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত। এটা অভিমানী ও আহত মুসলমানদের সময়ের প্রেক্ষাপটে উপেক্ষা, না প্রবল গোষ্ঠীয় চেতনার বিপরীত স্রোতধারায় অবগাহনে অস্বীকৃতির রূপ! এটা অবশ্যই বলা যায় পশ্চাৎপদতার মানসিক সঙ্কট, সংস্কৃতির সঙ্কট, ভাবাবেগের বৈপরীত্য বটে। সবকিছুর পিছনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক ও প্রকৃত শিক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের একশত নয় বৎসরের পশ্চাৎপদতা।

ডা. কাশেম সেসময়ের উত্তাপ দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ছোঁয়া পেয়েছিলেন, এমনকি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গেঁথে নিয়েছিলেন একজন বিশ্বনাগরিকের অংশ হিসেবে। এ ধরনের বিষয় তাঁর জীবনে পরবর্তীতে ধরা পড়েছে, পরে দেখবো। কোলকাতায় যাওয়ার আগে তিনি চট্টগ্রামের বিকাশমান মুসলিম সমাজে বেশ আলোড়ন তোলেন। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় সমস্ত বাংলার মধ্যে Gold Medal প্রাপ্ত হন। সমস্ত বাংলার মেডিক্যাল স্কুলগুলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল এবং Gold Medal প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে স্কুলে মেডেলটি পাঠিয়ে দেয়া হতো। এছাড়াও সে ছাত্র অর্থাৎ গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত ছাত্ররা আপনা-আপনি কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু ধর্মীয় বৈষম্যের যাঁতাকলে পড়ে কাশেম দুটোই বঞ্চিত হলেন। কিন্তু চট্টগ্রামবাসীরা অন্যভাবে তরুণ প্রতিভাবান কাশেমকে

পুষিয়ে দিলেন। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অগ্রসর মুসলিম হিসেবে হাতী কোম্পানীর মালিক অগ্রগণ্য ছিলেন। বিশিষ্ট মুসলিমরা Gold Medal এর Replica তৈরী করে ডা. কাশেমকে নাগরিক সম্বর্ধনার মাধ্যমে তা প্রদান করেন। আর কোলকাতায় উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তির জন্য মেডিক্যাল কলেজে ছয়মাস ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু মুসলিম ছাত্র হওয়ার বিড়ম্বনায় তা আর হয়ে উঠেনি। এরকম অবস্থায় তিনি বিখ্যাত চক্ষু সার্জন ডা. কিরণ শংকর রায়-এর নজরে পড়েন। ঘটনা শুনে ডা. রায় তাকে ৬ মাসের চক্ষু বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি সরঞ্জাম নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু চট্টগ্রামে আসার পর শুভ্যানুধায়ীদের পক্ষ থেকে General Physician হওয়ার দাবীকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। অর্থাৎ চক্ষু ডাক্তারের পাশাপাশি জেনারেল প্রাকটিশনার। সেসময় তাঁর প্রিয় শিক্ষক কর্ণেল চ্যাটার্জি ছিলেন বৃহত্তর চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন। তিনি ছাত্র ডা. কাশেমকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আর কাশেমও তাঁকে গুরুদেব জ্ঞান করতেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বৈষম্যমূলক আচরণে মর্মাহত ছিলেন বিধায় তিনি কাশেমকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতেন। ডা. চ্যাটার্জি পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক হয়েছিলেন।

ডা. কাশেমের প্রকৃত নাগরিক জীবন শুরু হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে কোলকাতায় যাওয়ার পর। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল থেকে এলএমএফ (ডাক্তারী) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করলেও কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সাম্প্রদায়িকতার কারণে সেখানে ভর্তি হতে পারেননি। কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চট্টগ্রামের পিছনে স্থান পাওয়া হিন্দু ক্লাশমেটের ভর্তি হওয়াকে ঔদার্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। একজন অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের অধীনে সহকারীর কাজ দিয়ে কোলকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় এক বৎসর কোলকাতায় কাটিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে এসে মেডিক্যাল স্কুলে যোগদেন এবং ডাক্তারী প্র্যাকটিস করতে থাকেন। এর মধ্যে পিতার পছন্দের ঘরে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং একমাত্র সন্তান জন্মের ঘটনা প্রবাহ চলতে চলতে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে মেডিকেল কোরে ডাক্তার পদে কর্মকর্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে কমিশন পর্যায়ে ডাক্তার

গ্রাজুয়েটদের ভর্তির নিয়ম থাকলেও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সারা বিশ্বে কলোনীইজম টিকিয়ে রাখতে এবং যুদ্ধ পর্যায়ের জরুরী অবস্থা মেটানোর জন্য এলএমএফ'দের মেডিক্যাল কোরের কমিশন র‍্যাঙ্কে সুযোগ দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ডা. চ্যাটার্জি কাশেমকে ব্রিটিশ আর্মিতে যোগ দিতে অনুপ্রেরণা যোগান। কারণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে MBBS ডিগ্রি অর্জনে সুবিধা হবে।

ডা. কাশেম এ সুযোগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথমেই লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হয়ে ব্রিটিশ ট্রুপের সাথে গোটা ভারতবর্ষ যথা দেরাদুন, অমৃতসর, লাহোর, কলকাতা ইত্যাদিতে অবস্থান করেন। ডা. কাশেম সাধারণ সৈনিকদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার, সাধারণ্যে মেশার ক্ষমতা, মেধাবী মননশীলতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আইন-কানুন নখদর্পণে রাখতেন। ফৌজি কালাকানুন থেকে আইনের মারপ্যাঁচে অনেক স্বল্প শিক্ষিত ভারতীয় সৈনিকদের বাঁচিয়ে দিতেন।

এর পিছনের গল্পটি হল, আর্মিতে ট্রেনিংয়ে থাকাকালীন জুনিয়র অফিসার্স মেসে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সুপেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে আলাদা টেবিলে খেত, এজন্য কোন নিয়ম ছিল না। এরকম চলতে চলতে একদিন এ্যাংলো ও ভারতীয়দের মধ্যের উত্তেজনা মারামারিতে পর্যবসিত হয়। কাশেম ভাল ডিবেটর হওয়ায় ভারতীয় বন্ধুরা তাঁকে কোর্ট অফ এনকোয়ারিতে Defense Councilor নিয়োগ করেন। এই বিষয়টি সেসময় সারা ভারতে আলোড়ন তুলেছিল, ভারতীয়রা জিতেছিল। সারা ভারতের মিডিয়াতে ডা. কাশেমের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ধর্মগোত্র নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁকে কোন এক অভিযুক্ত সৈনিকের মনোনীত ডিফেন্স কাউন্সিলর হিসেবে কোর্ট মার্শাল ট্রায়ালে যোগ দিতে প্রায়ই ট্রেন ধরতে হতো। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ডা. কাশেমের প্রচুর জনপ্রিয়তায় বিব্রত হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তাঁকে ভারতের বাইরে নিয়োগ দেয়। কিন্তু আগাম কয়েক মাসের Defense Councilor-এর appointment থাকায় বিদেশের Posting কার্যকর করা যাচ্ছিল না। এরকম এক সময়ে পেশওয়ারে একটি কেস ডিফেন্ড করে তিনি লাহোরে আসেন। রাত আড়াইটার সময় লাহোর স্টেশনে, অন্য কোন কেসের তারিখ নির্ধারণ হওয়ার

আগেই, তাঁকে মার্চিং অর্ডার দেয়া হয় মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কে মিসরে জার্মান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। ক্যাপ্টেন ডা. কাশেম ব্রিটিশদের 8th Army Indian Medical Core-এর অফিসার হিসেবে মিসরে Tobruk যুদ্ধের পর জার্মান বাহিনীর জেনারেল রোমেল-এর সেনাদের দ্বারা একটি বিশাল এলাকায় (বেনগাজীতে) পরিবেষ্টিত হয়ে ২/৩ সপ্তাহ ছিলেন। তখন আজাদ হিন্দ ফোর্সের সেকেন্ড ইন কমাণ্ড রাসবিহারী বসু জার্মান তথা অক্ষশক্তির বেতারে ব্রিটিশ বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য বিবৃতি দিতেন। এমনকি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় ইংরেজিসহ প্রচারপত্র আকাশ পথে ভারতীয় সৈন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হত। লিফলেটের বক্তব্য ছিল এরূপ, Indians why you are fighting for? You are fighting a colonial war! Please surrender. ফরোয়ার্ড ফিল্ড হাসপাতালটি বালুর নীচে ব্যাংকার করে তৈরী ছিল। কাশেম নিকটতম বন্ধু ডা. মুখার্জির সাথে এ ধরনের ব্যাংকারে ছিলেন। তারা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে গোপনে রাসবিহারী বসু'র ভাষণ শুনতেন। তাঁদের পাঠান ব্যাটম্যান বিষয়টা টের পেয়ে কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল এর কাছে ফাঁস করে দেয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড লাইনে এ ধরনের দোষী সাব্যস্ত হওয়া মানেই নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড। সৌভাগ্যক্রমে কর্ণেলটি জাতে আইরিশ হওয়ায় অল্পের ওপর দিয়ে যায়। আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা ডি ভেলেরা দ্বারা ভারতীয় বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, আইরিশ কর্ণেল বিষয়টা ভাল করেই জানতেন। কর্ণেল ভেতরে উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন। সেজন্য কাশেম ও মুখার্জির অন্য একটি অপরাধ দেখায়ে ৬ মাসের seniority রহিত করে দেয়। যার ফলে পদোন্নতিযোগ্য কাশেমের আর মেজর হওয়া হয়নি এবং এর মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। ভারতে সেনাবাহিনীতে চাকুরীকালীন সময়ে কাশেম মেজর থিমায়ার নজরে পড়েন। পরবর্তীতে থিমায়া স্বাধীন ভারতের সেনাপ্রধান হয়েছিলেন। মিসর থেকে ভারতে ফিরে আসার পর কাশেম গুর্খা রেজিমেন্টে দেরাদুনে পোস্টিং পান। দেরাদুনে অগুর্খা ডা. কর্মকর্তা হিসেবে প্রশংসা লাভ করেন। বন্ধু ডা. মুখার্জি ও

থিমায়ার আগ্রহে এবং অনুরোধে কাশেম দেশভাগের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অপশন দেন।

তিনি যেখানেই অবস্থান করেন না কেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল থাকতেন, যার বীজ চট্টগ্রামে রোপিত হয়েছিল। আসলে তিনি ভারতীয় সিভিল সোসাইটি, ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দোহারা গড়নের, বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা প্রাকৃতজনের সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠা। তিনি পাকভারত বিভাজনের রাজনীতির শেষ অধ্যায়ে জড়িত ছিলেন না। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগে কোলকাতার পূর্ববঙ্গীয় উঠতি রাজনীতিবিদদের সাথে ওঠাবসা ছিল। তিনি কিছু সময় কোলকাতার 'বেকার হোস্টেলে' যাতায়াত করেছেন এবং মুসলিম ছাত্রদের প্রাণান্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর ভক্ত ছিলেন। কলকাতায় মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে প্রখ্যাত আবুল হাশিমের প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকায় শেষদিকে ভারতীয় রাজনীতি বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না-থাকা এবং নেতাজি সুভাষ বসুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হেতু খণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রতি অপশন দিয়েছিলেন। কেননা নেতাজি সুভাষ বসুর নেতৃত্বের প্রতি সেসময়কার ভারতবর্ষে সকল প্রগতিশীল জাত-ধর্মের মোহ ছিল। ইতিহাসের 'যদি'র পাতায় বলা হয়ে থাকে, সুভাষ বসু কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অপসৃয়মান না হলে অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ জয়লাভ করলে আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশের পূর্বসীমানা পর্যন্ত অখণ্ড ভারত থাকতো।

কপালের লিখন খণ্ডানো যায় না বলে কথা আছে। এমনই কপালে ডা. কাশেমের জীবন বৈচিত্রময় হয়েছে। দেশভাগের কয়েক মাসের মাথায় চরম অভিজ্ঞতায় ভরা জীবনের একাংশে ডা. কাশেমের জীবন কোলকাতায় শঙ্কার মধ্যে পড়লে শিখ সহকর্মীর সহায়তায় প্রাণ নিয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। বিষয়টা অত্যন্ত বেদনাময় ছিল। সেসময় যুদ্ধফেরত ভারতীয় এলএমএফ ডাক্তারদের MBBS-এ উন্নীত করার জন্য কর্তৃপক্ষ Lake Medical College নামকরণ করে কোলকাতাতে পরিত্যক্ত আর্মি স্থাপনায় একটি Medical College স্থাপন করে। পরিচিতদের মধ্যে ডা. বাদশা মিঞা চৌধুরী (চট্টগ্রামের), মেজর

ডা. আহম্মদ আলী (প্রফেসর আসহাবউদ্দীন চৌধুরীর ছোট ভাই), ডা. মুখার্জি ও ডা. কাশেম সেখানে পড়াশোনা শুরু করেন। তাঁরা পড়াশোনাকালীন পরিত্যক্ত আর্মি ব্যারাকে থাকতেন। সেসময় এক শিখ ছাত্র কর্মকর্তা (যার পরিবার অমৃতসর গুরুদুয়ার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য) ও উড়িষ্যার এক হিন্দু ছাত্র কর্মকর্তা (কট্টর হিন্দু মহাসভার সদস্য) ক্লাসমেটের সাথে কাশেমের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তথাপি ডা. মুখার্জি ঘনিষ্ঠতম ছিলেন। ক্লাশে বা পড়াশোনার ফলাফলে ডা. মুখার্জি কাশেমের সাথে পেরে উঠছিলেন না। আসন্ন পরীক্ষার ফলাফলে কাশেমের প্রথম স্থান অধিকার নিশ্চিত হচ্ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের কাঁটা অপসারণ করতে ডা. মুখার্জি কাশেমকে একমাত্র ছেলেসহ মেসের ডাইনিংয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেন। কেননা কোলকাতায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলেটি প্রায়ই পিতার মেসে এসে থাকতেন। কট্টর হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও উড়িষ্যার বন্ধুটি মুখার্জির একাজ (ছেলেসহ খুন) পছন্দ করেননি। তিনি সকালে বিষয়টি শিখ বন্ধুকে ফাঁস করে দেন। ঘটনাটি ছিল গান্ধীজি'র হত্যাকাণ্ডের মাস খানেক আগের এক দুপুরে। কাশেম কলেজ থেকে ফিরলে দুপুরে খাওয়ার জন্য ডাইনিংয়ে যাওয়ার পথে আক্রমণ হবে। কাশেম ব্যারাকে ফেরার সাথে সাথে সকাল ১১টার দিকে শিখ বন্ধু BSA মোটর সাইকেলের সাইডে ছেলেকে ও পিছনে কাশেমকে বসিয়ে সিনেমাটিক এ্যাকশনে পিস্তল উঁচিয়ে বইপত্রসহ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসেন এবং পার্ক সার্কাসে পরিবারের কাছে পৌছে দেন। কাশেমের পরিবার পার্ক সার্কাসের ঝাউতলা রোডের ২২ নম্বর বাসায় থাকতেন, যা তাঁর বন্ধু চট্টগ্রামের হাতী কোম্পানীর মাহবুব আহমেদ চৌধুরীর ছিল। এরপরও তিনি দোটানায় পার্ক সার্কাস থেকে একমাস ক্লাস করেন। মহাত্মা গান্ধী মারা যাওয়ার পর ভারতে থেকে যাওয়ার আশা ছেড়ে দেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিতে কলকাতায় কাশেম দেখা করেন সেই গুরুদেব কর্ণেল চ্যাটার্জির সাথে। কর্ণেলের বক্তব্য ছিল ব্যথাভরা, 'সাম্প্রদায়িকতার এই ক্লেদ ও গ্লানি সহজে মুছবার নয়, তাই তুমি অন্তত একমাত্র সন্তানের ভবিষতের জন্য পূর্ব পাকিস্তান চলে যাও'।

এরপর সেনাজীবন ত্যাগ করে পাকিস্তান হেলথ সার্ভিসে যোগ দেয়া এবং পূর্বের কোর্সের অংশ হিসেবে ঢাকাতে এসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমস্থান

অধিকার করে এমবিবিএস পাশ। এভাবে চলতে চলতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল, রাজবাড়ীতে চিকিৎসকের বিভিন্ন পদে ও খুলনাতে সিভিল সার্জন পর্যায়ে চাকুরী করেছেন। ঢাকা থেকে চাকুরী শেষ হওয়ার আগেই ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের টিকিটে বঙ্গবন্ধুর চট্টগ্রামের কাণ্ডারী আজিজ মিয়া'র উৎসাহে ও ডাকে সাড়া এবং চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে অন্য জীবনের স্বাদ নেয়া। রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বলার কিছু নেই, তা অন্যরা বলবেন। এটা বলা যায় প্রথম সংবিধানের স্বাক্ষরকারী হিসেবে তিনি স্বাধীন দেশে অমর হয়ে থাকবেন।

ডা. কাশেম ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, মেধাবীদের মূল্যায়নও করতেন। তিনি জীবনের চলার পথে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে চলতেন, অধ্যবসায়ী, মিতব্যয়ী ছিলেন। আঞ্চলিকতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ ছিলেন না কখনোই। কর্মজীবনের বিস্তৃতির মতো তাঁর মনের চাতাল ছিল আকাশছোঁয়া। সারাজীবন সাদাসিধে জীবন কাটিয়েছেন। আর মহান দেশপ্রেমিকের মতো নিরলসভাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন। দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, তিনিই দেশপ্রেমিক যিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

মানব জীবনের সৃষ্টি সার্থক হওয়া নির্ভর করে, যখন সে নিজ সমাজ/গোষ্ঠীকে ন্যূনতম পর্যায়ে সামনে এগিয়ে নিতে পারে। এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধারায় হতে পারে। পুণ্য জীবনের বিলয়ে যেমন সার্থকতা, তেমনি পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে টেনে ধরার প্রক্রিয়ায় স্থির বিমূর্ত চিত্র তাকে অমরতা দান করে। শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন করে না স্মরণীয় হওয়ার জন্য, সাহিত্যিক সাহিত্য উৎপাদন করে না বরণীয় হওয়ার জন্য, এটা তাদের স্বভাবজাত কর্মকাণ্ড। ডা. কাশেম তাঁর বৃত্তিয় জগতে তেমনই শিল্পের উৎপাদক ছিলেন। এখানে রাজনীতিক হিসেবে না, একজন পেশাজীবীয় নিরিখে তিনি এ জনপদে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং স্বাস্থ্য সেবা ও মেডিসিনে অবদান :

সম্পূর্ণ জনগণের সহযোগিতায়, তিনি খুলনায় চাকুরীকালীন সময়ে নিম্নোক্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করেছেন :

ক) সদর হাসপাতাল কেবিন।

খ) শিশুদের ওয়ার্ড।

গ) মহিলাদের অস্ত্রোপচার ওয়ার্ড।

ঘ) ব্লাড ট্রান্সফিউশান কেন্দ্র।

ঙ) হালিশহরে কারখানার শ্রমিকদের জন্য টি.বি. ক্লিনিক।

চ) দাতব্য লেবার কেবিন।

ছ) চালনা কোর্টে মেরিনার্স হাসপাতাল।

জ) চালনা বন্দরে গরিব লোকদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা (কারণ সেখানের পানীয় জল লবণাক্ত হওয়ায় খুলনা শহর হতে আনতে হতো)।

ঝ) জেলা কাউন্সিল এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটির সহযোগিতায় সাতক্ষীরাতে এক্সরে ব্যবস্থা।

ঞ) স্বাস্থ্য শিক্ষা পাইলট প্রজেক্ট।

ট) পারিবারিক উন্নয়ন প্রজেক্ট।

ঠ) এলাকার শিল্পপতিদের সহযোগিতায় এবং পরিচালিত শিল্প এলাকায় ৫০০ বেডের শিল্প হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ। জমি খরিদ প্লান তৈরী এবং স্কিমটি তাঁর বিদায়ের সময় পর্যন্ত ভালো অগ্রগতি অবস্থায় ছিল।

ড) খুলনা পরিবার পরিকল্পনা এসোসিয়েশনের সচিব এবং খুলনা পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ঢ) চাকুরিকালীন সময়ে টি.বি. এসোসিয়েশন খুলনা শাখার প্রথমে সচিব এবং পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ণ) ১৯৬৪ হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের পরিবার পরিকল্পনা নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং তারপর এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ত) ১৯৬৩ সনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনিস্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে পল্লী মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে লেকচার প্রদান করেন।

থ) পূর্ব পাকিস্তান সরকার অবসর নেয়ার পর হেলথ স্টাডি গ্রুপের সদস্য হিসাবে নিয়োগকৃত হন।

াজনৈতিক সফলতা :

ক) অবসর গ্রহণের পরে (১৫-১১-১৯৬৯) ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

খ) থানা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, জেলা কাউন্সিলর, জেলা কার্যক্রম কমিটির মেম্বার এবং প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হন।

গ) ১৯৭০ সনে প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলির সদস্য এবং ১৯৭৩ সনে সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং সভায় অংশগ্রহণ :

ক) ১৯৭১-৭৪ পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে জেনারেল সেক্রেটারী এবং ম্যানেজিং বোর্ডের মেম্বার এবং পরে বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান। ১৯৭৪-৭৭ পর্যন্ত জাতীয় রেডক্রস সোসাইটির ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

খ) বাংলাদেশ টি.বি. এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত (১৯৭১-৭৫) এবং ১৯৭৫-৮৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম টি.বি. এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।

গ) বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত (১৯৭১-৭৬)।

ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর-এর বোর্ড অব গভর্ণরস্-এর সদস্য (১৯৭৫-৭৫)।

ঙ) প্রাক্তন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ও.আই.এস.সি.এ (আন্তর্জাতিক)।

চ) প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা এসোসিয়েশন (১৯৭১-৭৬)।

ছ) প্রাক্তন সদস্য, বাংলাদেশ জনসংখ্যা কাউন্সিল।

জ) প্রাক্তন সদস্য, পরামর্শক কমিটি জেলা স্বনির্ভর পরামর্শক কমিটি।

ঝ) প্রাক্তন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ৮-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ঞ) প্রাক্তন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, চট্টগ্রাম।

ট) পরিচালক, হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।

ঠ) প্রাক্তন সচিব, চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ এবং ভাইস চেয়ারমান, বাংলাদেশ সমবায় বই সমিতি লিঃ, চট্টগ্রাম।

ড) প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রাঙ্গুনিয়া কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

বিদেশে অংশগ্রহণ :

ক) দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধকালীন চাকুরী হিসাবে ভ্রমণ।

খ) ১৯৭২ সনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেডিক্যাল কনফারেন্সে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি প্রধান হিসাবে অংশগ্রহণ এবং ভারতে জনাব ভি. ভি. গিরি যখন প্রেসিডেন্ট হন তখন সূচনা অধিবেশনে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে অংশগ্রহণ।

গ) ১৯৭২ সনে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত সিডনিতে 'বিশ্ব মেডিক্যাল কনফারেন্সে' বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ।

ঘ) ১৯৭৪ সনে রোমানিয়ার বুখারেষ্টে বিশ্ব জনসংখ্যা কনফারেন্সে অংশগ্রহণ।

ঙ) ১৯৭৪ সনে লন্ডনের আই.পি.পি.এফ অংশগ্রহণ।

চ) ১৯৭৫ সনে পূর্ব বার্লিনে মহিলা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ।

ছ) শ্রীলংকা, বোম্বে এবং কলকাতায় পরিবার পরিকল্পনা কনফারেন্সে অংশগ্রহণ।

জ) ১৯৭৮ সনে জেনেভা রেডক্রস কনফারেন্সের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ।

ঝ) মস্কো, সিঙ্গাপুরে প্রতিনিধি হিসাবে সফর করেন।

ঞ) সৌদি আরব সফর করেন।

ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডা. কাশেম আঞ্চলিকতার কাদা গায়ে মাখেননি। তিনি বৃহত্তর ভারতে যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোয় বিস্তৃতভাবে বসবাস করাতে আঞ্চলিকতা নামক ক্ষুদ্রাতির ছাই-ভস্ম গায়ে মাখেননি। যার

স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন নিজ শ্যালিকাদের পাত্রস্থ করার ক্ষেত্রে। তেমনি বয়সের শেষ প্রহরে সবচে প্রিয় আদরের নাত্নীকে পাত্রস্থ করার ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে মানদণ্ডে গ্রহণ করে এ-অধমকে আত্মিক করেছেন। প্রায় এগার বছরের সংশ্রবে বিভিন্ন ক্রাইসিস মূহুর্তে তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় নিজেকে তাঁর পরিবারে অঙ্গীভূত হওয়ার সার্থকতাকে মাথা পেতে নিই। তাঁকে কোন্ ভাষায় সম্মান বা অভিধা করলে তিনি মহৎ হবেন তা আমার জানা নেই। তবে আমার প্রতি তাঁর আবেগ-ভালবাসা বহতা কর্ণফুলীর মতো ছলাত-ছলাত দৃশ্যমান ছিল। আমাকে যে গুরু দায়িত্ব নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন, যেভাবে পরবর্তী পরিস্থিতি সামলে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছেন তা ক্ষুদ্র জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা অন্যতম যোগ্য সামাজিক নেতা। আমার সন্তান তার বংশের অংশ, আমার কৃতজ্ঞতা অন্তহীন, তা আবেগের, সেই সাথে উচ্ছ্বাসের, প্রণতির ধারায় সমর্পিত, সমর্পণের নতজানুতে উদ্ভাসিত। এর ভাষা জানা নেই, তাই রবি ঠাকুরের কাছে হাত পাতবো –

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

(লেখক পরিচিতি : লেখক ডা. কাশেমের বড় নাতনী জামাই। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের পদস্থ কর্মকর্তা। পেশার বাইরে তিনি কথাশিল্পী, কবি ও প্রবন্ধকার)

অনন্তের পথে

(ডা. ক্যাপ্টেন আবুল কাশেম স্মরণে)

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান

বহুকাল ধরে হাঁটি নশ্বর মায়াবী
পথে বিস্ময়ের ঘোরে পথের প্রান্তে স্মৃতি আগলায়
স্বজন মমতায় ঘাসফুল স্বর্ণলতা
বহতা কর্ণফুলির বাঁকে মরমী বাঁশি
ডাকে দূর পাহাড়ে ঘন সবুজ বুক
এস্‌রাজের সুরে উড়াল মেঘের নিঃসঙ্গতা।
নেকাব উড়ে পেলমেটে সফেদ কেবিনে
শিশির বিন্দু জমে কপোলে ঘুমজাগরণে কাটে
জলো আঁধার টিলার ওপাশে।
আলোকিত সব প্রাণের আশা জাগে বিমূর্ত ভোরে।
অতঃপর শিয়রে মলিন সিলিন্ডার সিরিঞ্জ
স্যালাইন স্ট্যান্ড কৃপণ হাসিতে দাঁড়ায়
নীলিমা ধূসরিত ব্লিজার্ডের হাওয়ায়
প্রস্রবণের মুখে পাথর খসে অনন্তে
চলে নদীর ধারা পাড় তার শোভিত
বাগান আর কুজনে ভরা।

চট্টগ্রাম ১৯৯৯

নিঃশব্দ বিকেলে

(মরহুম ক্যাপ্টেন ডা. আবুল কাশেম'কে)

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান

হে প্রিয় তুমি ফিরে এসো এ প্রাণের আলোয়
দেখ সবুজ ভূমিতে চরে গাঙ শালিকের ঝাঁক
স্রোতের দিগন্তে ভাসে ডিঙ্গির মেলা
এই বেলা উড়ে যায় মেঘের ভেলা।
হে প্রিয় তুমি ফিরে এসো এই জনপদে
দেখ টিয়ার চঞ্চুতে ভরে শস্যদানা
কৃষকের ভূমি হয় সোনার থালা
ডাহুকের রঙ মাখে পড়ন্ত বিকেল।
হে প্রিয় তুমি ফিরে এসো এ দিগন্ত নীলিমায়
উদাস মেঘে অথবা অসাধ সন্ন্যাসে,
কোন এক নিঃশব্দ বিকেলে
জলছাপ ক্যানভাসে বিমূর্ত সত্তায়
মোহন বাঁশীতে জেগে ওঠো
দীপ জ্বেলে অলক্ষে সবার।

চট্টগ্রাম, ৪ এপ্রিল ১৯৯৯

বড় মামা

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

বড় মামার কথা বড়ই মনে পড়ে। বড় মামা যে আমার সবচে' প্রিয় মামা তা কিন্তু নয়। আবাল্য সে আসন দখল করে আছেন দু'জন – এক. মা ও মামাদের মামাতো ভাই ইউসুফ মামা। দুই. সবচে' ছোট মামা বজল। তাঁদের কথা পরে আসবে। কেননা বড় মামার জীবনে, বিশেষ করে শেষ জীবনে, এই দুই মামা ছিলেন নানাভাবে সম্পৃক্ত – একেবারে কাছের মানুষ।

বড় মামা মানে যথার্থ বড় মামা। মনে হতো যেন আলাদা ব্যক্তি। এমনকি এ পরিবারেরও যেন কেউ নন। এখানে 'বড়' কথাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বড় ছেলের অবস্থান সেকালে, হয়তো বা সর্বকালেই ছিলো গুরুত্ববহ। সেটা আমি অনুভব করেছি আমার নিজের যাপিত জীবনে। আমাদের পরিবারে আমিও বড় ছেলে। অনেকের কাছে, বিশেষ করে বাবার কাছে, আমার স্থান ছিলো সর্বোচ্চে। মনে হয় 'সার্বভৌম' কথাটা ব্যবহার করা যায়। মা-র কাছেও তাই। তবে আসলে দু'জনেই আশ্চর্য ব্যালান্স করে চলতেন পারিবারিক সম্পর্ক বিন্যাসের ক্ষেত্রে।

এই স্মরণিকার 'স্মরণে' লেখক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানও স্বয়ং তাঁর পরিবারের বড় ছেলে। শাহ্ আলী বোগদাদী ঘরানার অধঃস্তন একটি পরিবারে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ্যপুত্র। সেজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠাও ছিলো সেরকম।

যাহোক, বলছিলাম, বড় মামার কথা। বড় মামা বড় এবং আলাদা। তাঁর ছোট এবং আমাদের একমাত্র খালা ছিলেন এক জমিদার পরিবারের মেজ ছেলের পুত্রবধূ। কবিয়াল রমেশ শীলের

বাড়ি ও প্রবর্তক সঙ্ঘের মাঝামাঝি শাকপুরা-বোয়ালখালির এক বড় বাড়িতে গৃহকর্মে সদাব্যস্ত। এক কালের সমুদ্রগামী জাহাজ ও বহু দোকানপাটের মালিক সওদাগর ও জমিদার বাড়ি।

মেজ মামা আবুল খায়ের ছিলেন ঈষৎ মুখচোরা, আয়েষী জীবনে বিশ্বাসী, ছোট খাটো কাজকর্ম আর নতুন সাইকেল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সদাসর্বদা। নানা তাঁর ওপর সংসারের ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে পড়াশুনা ও অধ্যাত্ম-সাধনা নিয়ে থাকতেন। মেজ মামা আমার মায়ের ফরমাশ মোতাবেক রাঙ্গুনিয়া থেকে চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে নতুন গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করে নিয়ে আসার ব্যাপারে ছিলেন তৎপর। এটা আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা।

আমার মা মোস্তফা খানুম ছিলেন যেমন সুশ্রী, তেমনি বুদ্ধিমতী ও তেজস্বী। বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়িতে তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। বড় মামা কদাচিৎ গ্রামে এলে মাইল খানেক দূরে আমাদের বাড়িতে ছোটবোনকে দেখতে আসতেন।

তাঁদের ছোটভাই বজল সবার প্রিয় কিন্তু ভীষণ দুরন্ত। আবাল্য লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়ায় অভ্যস্ত। এক পর্যায়ে বড় মামা তাঁকে তাঁর সঙ্গে থেকে পড়াশোনার জন্য নিয়ে গেলেন। অন্যবার যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে তাঁর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে কোথায় যেন থাকার ব্যবস্থা করলেন। এগুলো ১৯৪০ সালের আগে-পরের ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি বোমায় আক্রান্ত হবার ভয়ে আমরা ১৯৪১ সালের মধ্যভাগে চলে আসি গ্রামে। আমি তখন খুবই ছোট। কিন্তু মধ্য-৪০শে আমি কালাজ্বরে আক্রান্ত হলে ছোট মামা আমাকে পৈতৃক নিবাস রাঙ্গুনিয়া থেকে শহরে তখনকার দিনে সবচেয়ে নামকরা চিকিৎসক হরিহর দত্তের কাছে দুই-তিনবার নিয়ে আসেন। একবার বোমা আক্রমণের সাইরেন বেজে উঠলে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মাটির নিচে বাংকারের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এটা মনে পড়ে। এর কিছু পর ছোট মামাকে দেখি স্বগ্রামের ওয়াকিল আহমদ, হাফেজ চৌধুরী ও মেজ মামার শ্যালক আবুল কাশেম ও আরো কিছু উদ্দীপ্ত তরুণকে নিয়ে মিলিটারি জামাকাপড় পরে, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের ট্রেনিং-এ নেতৃত্ব দিতে। তারপর ১৯৪৬ এবং ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে

সক্রিয়ভাবে ব্যস্ত দেখতে পাই তাঁকে। অনেক পরে এইসব অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজে লাগালেন তাঁর আপন বড় ভাই অর্থাৎ আমাদের বড় মামার ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে দুইঁবারই জয়যুক্ত হয়েছিলেন বড় মামা।

বড় মামার দুই বোন ও দুই ভাই সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা হলেও তাঁর পিতা বা নিজের পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি। বড় মামার বড় হয়ে ওঠার পেছনে যাঁর অবদান সবচে' বেশি তিনি হলেন আমার নানা আবুল হাশেম। পিতাপুত্রের চেহারায় ছিল আশ্চর্য সাদৃশ্য, ফর্সা টকটকে রঙ, শাণিত চোখ, মাঝারি আকারের নির্মেদ সুপুরুষ। জনাব আবুল হাশেম শুধু রাঙ্গুনিয়ার নন বরং চট্টগ্রামের বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। অনেকের ধারণা ছিল তিনি রাঙ্গুনিয়ায় প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট। কিন্তু একবার আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, মাত্র ৭ নম্বরের জন্য ফার্সিতে ফেল করেছিলেন। আর্থিক কারণে আর পরীক্ষা দেওয়া বা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ সারা জীবন তাঁকে বহু আরবি-ফার্সি, ইংরেজি-বাংলা, ধর্ম-পুস্তক সংগ্রহ করে পড়তে দেখেছি। পরবর্তীকালে তাঁর অনুমতিক্রমে কিছু বাংলা ও ইংরেজি বইপত্র আমি নিয়ে এসেছিলাম। এজন্য তিনি আমাকে একটি কাচের বড় আলমারিও দিয়েছিলেন, যা এখনও গ্রামের বাড়িতে আছে।

নানার গ্রন্থাগার থেকে নেওয়া আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ড. এনামুল হকের *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য*, ড. হকের *চট্টগ্রামী ভাষার রহস্যভেদ*, *আল-এসলাম*, *শরিয়তে ইসলাম*, *ইসলামিক রিভিউ* (লন্ডন থেকে প্রকাশিত, ১৯৩২) প্রভৃতি আমার সংগ্রহে ছিল। নানা ছিলেন চট্টগ্রামের ডিভিশন্যাল কমিশনারের হেড ক্লার্ক, তাছাড়া মহাফেজ, কানুনগো রূপে তিনি বাংলা ও বাংলার বাইরেও কর্মরত ছিলেন। অল্প বয়সে আমার মাও তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িশায় অবস্থান করেছেন বলে শুনেছি। প্রকৃতিপ্রেমী-রূপে বাইর থেকে বীজ বা চারাগাছ নিয়ে এসে তিনি বাড়ির চারপাশে কয়েকটি ভিটায় অনেকগুলো ফলের বাগান

করেছিলেন যা কৈশোরে আমার ও ছোটভাইবোনদের ভোগে এসেছিল।

চট্টগ্রামের মেয়র নূর আহমদ, মন্ত্রী জালাল উদ্দিন, রাজনীতিবিদ মওলানা ইসলামাবাদী, জে.এম. সেনগুপ্ত, কবি নবীন সেন, ডা. হাশেম, ডা. ওমর, সাহিত্য বিশারদ প্রমুখের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। সৌম্য, হাসিখুশি ও নূরানী চেহারার নানাকে সবাই সমীহ করত। তাঁকে প্রায়ই ফার্সি বয়েৎ বা গজল নিম্নস্বরে আবৃত্তি করতে বা গাইতে শুনতাম।

তাঁর স্ত্রী, আমাদের নানী, ছোটখাটো অসম্ভব ফর্সা মানুষটি ছিলেন। তবে প্রচণ্ড রাগী। সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। শুধু আমার মা ও আমি অব্যাহতি পেতাম। ১৯৬০ সালে আমি অক্সফোর্ডে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ কোর্স অধ্যয়নে গেলে নানা-নানীর মৃত্যু সংবাদ পাই।

নানীর একমাত্র ভাই নানা আব্দুস সামাদ, উত্তর দেয়াং থেকে বছরে একবার দুইবার আসতেন। তাঁর ছেলে নূর আহমদ, ইউসুফ আহমদ, সিদ্দিক আহমদ ও জামাল আহমদ আমাদের অতি প্রিয় মামা এবং তাঁদের একমাত্র বোন ডা. আব্দুস সবুরের মা সদাহাস্যময়ী খালা-আম্মা। বর্তমানে ইউসুফ মামা ও কাজিন ড. নুরুল হক ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তাঁদের বাড়িঘরও গ্রাস করেছে শিকলবাহা নদী।

নানারা বোধহয় পাঁচভাই ছিলেন। আমি একজন কি দুইজনকে দেখেছি। তাঁরা কেউ শিক্ষিত ছিলেন না। যিনি ছিলেন তিনি অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি হলেন আব্দুর রশিদ পেশকার সাহেব। তাঁর স্ত্রী মহাকবি হামিদ আলীর কন্যা এক অসাধারণ মহিলা। তাঁদের দুই পুত্র ডা. আবুল বাশার মুহম্মদ নুরুল আলম (যিনি বড় মামার সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রধান সহযোগী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব) এবং আবুল মনসুর মুহম্মদ শামসুল আলম (যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিকরূপে কর্মজীবন সমাপ্ত করেছিলেন)। বড় মামার অন্যান্য কাজিনরা প্রায় সবাই ব্যবসায়ী – চন্দ্রঘোনা কাপ্তাই রাঙ্গামাটিতে কাঠ-বাঁশের ব্যবসায়ে ব্যস্ত, দুই একজন কৃষক এবং একজন স্কুল শিক্ষক। তাঁর ভাইয়ের ছেলেরা ব্যাংক কর্মকর্তা অথবা মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত।

বড় মামা বিয়ে করেছিলেন সীতাকুন্ডের এক অভিজাত পরিবারের কন্যাকে। সেকালে তিনি ছিলেন বেশ আধুনিকা। স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ে আমি তাঁকে শপিং ও সিনেমায় নিয়ে গেছি বেশ কয়েকবার। মামী শ্বশুরকূলের মধ্যে আমার মা ও আমাকে সম্ভবত সর্বাধিক স্নেহ করতেন। তাঁদের এক ছেলে মাহবুব-উল আলম (সেলিম)-অল্প বয়স থেকে মাত্রাতিরিক্ত পড়াশোনা করে জীবনরসিক হবার সাধনায় মগ্ন; অত্যন্ত মেধাবী ও তুখোর তর্কবিদ। সেলিমের স্ত্রী খুলনার মেয়ে। তাঁদের তিন কন্যা – জুলি, রিয়া ও কেয়া। সুশিক্ষিতা ও সুগৃহিণী। বড় মামা ও মামীর অসামান্য আদর যত্নে কেটেছে ওদের শৈশব ও কৈশোর।

এবার আমরা একটু পেছনের ইতিহাস অনুসন্ধান করি। তখনকার স্মৃতি এখনও কিছুটা জাগ্রত। কিন্তু বেশ ক'বছর ব্যাপক খোঁজ-খবর করেও আমি খুব বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। কারণ বয়স্ক ও মুরুব্বী স্থানীয় কেউ এখন আর জীবিত নেই। তবে ৪০ ও ৫০-এর দশকের মধ্যভাগ অবধি মামার দুটি স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান। একটি হচ্ছে, বড় আকারের একটি ইংরেজি অভিধান। সেখানে তাঁর স্বহস্তে লেখা চার লাইনের একটি কবিতা : 'দিস বুক বিলংস টু আবুল কাসেম' আগের লাইনের সাথে মিল দিয়ে শেষ লাইনটি এখনও মনে আছে, 'দিস বুক ইজ মাইন আন্টিল আই ডাই'। অভিধানটি এখন অদৃশ্য। আর একটি বই, ইংরেজি উপন্যাস যা এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। সেটি হলো স্যার ওয়াল্টার স্কটের *আইভানহো* যাতে মেডিকেলের ছাত্র মামার স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু একটা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যা মামা বাড়িতে বাল্যকালে আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে দেয়ালে টাঙানো দেখেছি, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। ছবিটিতে সামরিক পোশাক পরিহিত তিন বাঙালি ডাক্তার-ক্যাপ্টেন ডা. কাসেম, নানা ডা. ক্যাপ্টেন কামরুজ্জামান ও আরেক ডাক্তার ক্যাপ্টেন সম্পর্কে ভগ্নিপতি, এখন নাম জানানোরও কেউ নেই। নানা কামরুজ্জামান (যাকে আমরা সেলিম নানা বলতাম) চট্টগ্রামে একজন প্রসিদ্ধ প্যাথলজিস্ট, মহাকবি হামিদ আলীর পুত্র এবং নাট্যকার মমতাজউদ্দীন আহমদের শ্বশুর। অনেক অনুসন্ধানেও ছবিটি কোথাও

পাওয়া গেল না। যাহোক, এই সূত্রে আমি বড় মামার জীবনবৃত্তান্তের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরতে পারি।

ডা. আবুল কাসেমের জন্ম : ১২ ডিসেম্বর ১৯১১

এল.এম.এফ : ১৯৩৪

এম.বি.বি.এস : ১৯৪৮

উভয় পরীক্ষায় সব বিষয়ে প্রথম স্থান তাঁর অধিকারে ছিলো বলে আমরা শুনেছি। এবং 'গোল্ড মেডালিস্ট' কথাটা তাঁর নাম ফলকের অনিবার্য অংশ হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় 'চট্টগ্রামী যুবকের কৃতিত্ব' এই মর্মে একটি প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ আমি পড়েছি। সেটি মামার এম.বি.বি.এস পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, তার কোন কপি আমাদের কাছে নেই। চিকিৎসকের ভূমিকায় মামা ১১ মার্চ ১৯৩৭ থেকে ১৪ মে ১৯৬৯ অবধি বিবিধ পদমর্যাদায় বৃটিশ বাংলায় এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন।

চিকিৎসকরূপে আমার কাছে বহু পরিচয়ের ৩টি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করছি। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসের আমার বন্ধু শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও তাঁর ফরাশি স্ত্রী আনির যমজ দুই কন্যার একজন ভয়ানক অসুস্থ হলে আমি মামাকে নিয়ে যাই তাদের বাসায়। মামা তখন এম.পি.এ, রাজনীতি নিয়ে মহাব্যস্ত। কথা প্রসঙ্গে মামা জানান, তিনি ফরিদপুরে জেলা হাসপাতালে কাজ করেছেন এবং রশীদের বাবার (তিনিও রাজনীতিবিদ এবং জমিদার) সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিলো। আবার সেই ১৯৭১ সালের অক্টোবর শেষে বৈরুত থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতা ফেরার সময় বিমানে আমার পাশের যাত্রী ছিলেন এক বয়োবৃদ্ধ ডাক্তার যিনি এক সময়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ও সার্জন ছিলেন। তাঁর খুবই মনে আছে, চট্টগ্রামে তিনি কাসেম ও কামরুজ্জামানকে পেয়েছিলেন বিশেষ অনুগত তরুণ সহকর্মীরূপে।

তৃতীয় দৃষ্টান্তটি আমার নিজের। ১৯৫৩ সালে আমি চট্টগ্রাম কলেজে বি.এ.-তে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করে অল্পপরে টাইফয়েডে আক্রান্ত হই। মামার বাসায় একরাত থাকার পর আমাকে চট্টগ্রাম জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কেবিন খালি না থাকায়

আমাকে বিশ-পঁচিশ জন রোগীর সঙ্গে বিরাট এক কক্ষে প্রায় নির্ঘুম রাত পোহাতে হতো। মামা তখন পুরো ওয়ার্ডের দায়িত্বে। তখন তাঁর খুব দাপট দেখেছি। ছাত্র, ইন্টার্নি, জুনিয়র ডাক্তার ও কর্মচারীবৃন্দ তাঁর ভয়ে তটস্থ। একটু সুস্থ হলে অবস্থা দৃষ্টে আমি ভারি মজা পেতাম বটে!

এর কয়েক বছর পর মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বাবধি তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন চট্টগ্রামের সেরা চিকিৎসক। সামাজিকভাবেও চট্টগ্রামে সমাজপতিরা যেমন, মেয়র ও.আর. নিজাম. হাতি কোম্পানির মাহবুব চৌধুরী, জমিদার পেঁচু মিয়া প্রমুখ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার কাছে ছিলো মামার গ্রহণযোগ্যতা। কিন্তু পরে বিলাতি ডিগ্রীধারী চিকিৎসকবৃন্দের আগমন ঘটলো। মামাও সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে বদলি হয়ে গেলেন (১৯৬৩ নভেম্বর অবধি)। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি খুলনায় সিভিল সার্জন ও ডেপুটি ডিরেক্টার হেল্‌থরূপে কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে খুলনায় চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্যর সঙ্গে বহু প্রকল্প সম্পাদন করেন তিনি। গ্রামীণ চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃত বিষয়ে সারা দেশে তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

ডা. কাসেম ১৯৬৯ সালে ১৫ নভেম্বর থেকে পূর্ণ অবসরে চলে যান। এরপর তিনি সত্যিকার ভাবে জনসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য রাজনীতির অঙ্গনে চলে আসেন। সত্বর তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং যথাসময়ে থানা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট এবং জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলার পদে নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম জাতীয় নির্বাচনে মামা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হন। সেই নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিধায় হাটহাজারী থেকে রাঙ্গুনিয়ায় গিয়ে আমি ভোট দিয়েছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের পক্ষে সংসদ-সদস্য প্রার্থী হন। সেবারও আমি ভোট দিতে গেলাম। ভোট কেন্দ্রে সবাই আমাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন। তবে বললেন, ভোট দিতে হবে না। ওটা দেওয়া হয়ে গেছে!

পুরনো দুটি ঘটনাও মনে পড়ে গেল।

১৯৫৪ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় চোখে সমস্যা দেখা গেলে তিনি আমাকে সেই সময়ে সেরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. টি. আহমদের কাছে একটা সুপারিশ-পত্রসহ পাঠান। ডা. আহমেদ ও তাঁর কন্যা অতি যত্নের সাথে আমার চিকিৎসা করেন যা পরবর্তীকালে প্যারিসে অনুমোদিত হয়েছিল। তাছাড়া ঢাকায় আমার দেখভালের জন্য একটা চিঠি দেন তখনকার বিখ্যাত সি.এস.পি এ.কে.এম. আহসানের কাছে। পরবর্তী বহু বছর আমি এই মহান ব্যক্তিত্বের গভীর জ্ঞানদীপ্ত পরামর্শ ও অসাধারণ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হই।

রাজনীতিবিদরূপে ডা. আবুল কাসেম সাহেবের ছিল খুবই কর্মব্যস্ত জীবন। কেননা তিনি জনগণের মঙ্গল ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ছিলেন একান্তভাবে সমর্পিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তিনি একজন মান্যগণ্য ব্যক্তিত্ব রূপে পরিগণিত। বিভিন্নসূত্রে আমি এই তত্ত্ব অবহিত হয়েছি।

১৯৭২ সালে ১৭ জানুয়ারি আমার একমাত্র মামা-শ্বশুর সাইদুজ্জামান খানের গোপীবাগের বাসায় এসে বড় মামা আমার শ্বশুর সৈয়দ আলী আহসানকে বঙ্গবন্ধু সকাশে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। আমি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে প্রবেশাধিকার পান তাঁরা দু'জন। পরে জেনেছি বঙ্গবন্ধু তাঁদের খুব সমাদর করেন এবং বহু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর দু'বছর পর লটারিতে হজ্জে যাবার আসন না পেলে বড় মামা বঙ্গবন্ধুর বিশেষ কোটা থেকে তাঁর প্রিয় ছোট বোন অর্থাৎ আমার মা এবং বাবার জন্য দুটি আসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। তাছাড়া বিধি মোতাবেক তিনি রাঙ্গুনিয়া কলেজের গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান নিযুক্ত থাকলেও কর্মব্যস্ততার কারণে তাঁকে প্রায় ঢাকায় ও বিদেশে অবস্থান করতে হয়। তাই অধ্যক্ষ সন্তোষ দাসের প্রস্তাবে আমাকে এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৭৭ সালে রাজশাহীতে কর্মরত হবার পূর্বাবধি আমি এই দায়িত্ব পালন করি।

মামাতো ভাই ইউসুফ বড় মামাকে শেষ জীবনে অনেক সাহচর্য ও সহায়তা দান করেছেন। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতিরূপে প্রাক-

বাংলাদেশ আমলেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৭১ সালে বড় মামা তাঁর বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রকল্পে তাঁর চাচাতো ভাই ডা. নূরুল আলম তাঁকে অনেক সহযোগিতা দেন। তাঁদের কর্মকাণ্ডে আমার ছোটভাই অকাল-প্রয়াত আকবর শাহও জড়িত ছিলো। পরবর্তীকালে ও ইউএনডিপির কাজে দেশের বাইরে চলে যায়। শেষ জীবনে সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ অধ্যাপক মোহম্মদ খালেদের সঙ্গে বড় মামার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। নানা রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও তাঁরা দু'জনেই জীবৎকালে চট্টগ্রামে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বরূপে বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করেছেন।

রাঙ্গুনিয়ায় আমার নানা আবুল হাশেম মহাফেজ সাহেবের সমাজসেবার একটা চিহ্ন এখনও বর্তমান। তাঁদের চন্দ্রঘোনা গ্রামের প্রবেশ-পথে কর্ণফুলীর সঙ্গে গুমাই বিলের সংযোগকারী, সেই সময়ে অতি প্রয়োজনীয়, একটি খাল তিনি সরকারিভাবে খনন করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যা এখনও স্থানীয় জনগণ 'মহাফেজ খাল'-রূপে স্মরণ করে থাকে। তাঁর সময়ে তাঁর সমকক্ষ শিক্ষানুরাগী সমাজপতি ছিলেন হাতেগোনা দু'চারজন। তাই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. আবুল কাসেম আরো বড় প্রেক্ষাপটে দেশ-সেবায় ব্রতী হবেন তা প্রত্যাশা করা যায় বৈকি! ইন্তেকালের এত বছর পরেও বড় মামা ডা. আবুল কাসেমকে যে লোকে স্মরণ করেন, তাতেই তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি ফুটে ওঠে।

বড়মামা ইন্তেকাল করেন ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯৯।

১০ জুন, ২০১৫

রাঙ্গুনীয়ার কৃতি-সন্তান

আবহমান কাল ধরে অবহেলিত অবজ্ঞাত রাঙ্গুনীয়ায় আজ নবজীবনের প্রাণস্পন্দন দেখা দিয়েছে। অ-শিক্ষা, কু-শিক্ষা আর অর্থনৈতিক নিপীড়নে জর্জরিত প্রকৃতির রম্যভূমি রাঙ্গুনীয়ার অধিবাসীরা আজ নবজাগরণের ইশারায় সজাগ হয়ে উঠেছেন। রোগ-মহামারী অধ্যুষিত এই এলাকার মানুষ আজ স্বাধীন দেশের উপযুক্ত সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুখর হয়ে উঠেছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের পরম সৌভাগ্য হয়েছে ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রাদেশিক পরিষদের জন্য ক্যাপ্টেইন ডাঃ আবুল কাশেম, এম.বি.বি.এস (গোল্ড মেডালিস্ট)-কে আপনাদের কাছে পরিচয় করে দেবার।

বলাবাহুল্য, ক্যাপ্টেন কাশেমকে পরিচিত করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কেননা, কয়েক যুগ ধরে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, দুঃস্থ মানুষ ও ছাত্রজনতা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবেই জানে।

তবু তাঁর জীবনেতিহাসের সঙ্গে পরিচয় লাভে রাঙ্গুনীয়ার নবজাগ্রত যুবসমাজ এবং প্রবীণরা সমভাবে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। একদা যিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার অন্যতম সেরা মেডিক্যাল স্টুডেন্ট, সেই ক্যাপ্টেন কাশেমের জন্ম হয় ডিসেম্বর, ১৯১১ সনে। রাঙ্গুনীয়া থানারই চন্দ্রঘোনা গ্রামে মরহুম মৌলবী আবুল হাশেম (মহাফেজ) সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি। এই পরিবারের একটি বিশেষ নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। তাঁর পিতা হাশেম সাহেব যখন বি.এ পড়তে যান, তখন রাঙ্গুনীয়া থেকে আর কেউ উচ্চশিক্ষা লাভ করেননি। কাশেম সাহেবও সে রকম প্রথম ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়নে যান এই অঞ্চল থেকে। পিতামহ বাকর আলী মাতব্বর সমগ্র থানার একজন প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি। বৈবাহিক সূত্রে তাঁরা চট্টগ্রামের

বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিতা আবুল হাশেম সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল কবি নবীন সেন, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, তদানীন্তন মন্ত্রী জালালুদ্দিন, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান নুর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে। এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি সাহিত্য ও সমাজসেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। উচ্চ সরকারী কর্মে অধিষ্ঠিত থেকেও হাশেম সাহেবের দেশ সেবার তুলনা বিরল। ক্যাপ্টেন কাশেমও পিতার কাছ থেকে এই শিক্ষালাভ করেন। হাশেম সাহেবের নানা মহতী সমাজসেবার নিদর্শনের মধ্যে মহাফেজ খাল এখনও স্থানীয় চাষীদের পরম উপকারে আসছে।

পিতার সরকারী কর্মসূত্রে কৈশোরে কাশেম সাহেব বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। ১৯৩০ সনে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে তিনি এল.এম.এফ অধ্যয়ন করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালে এই স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তাঁর এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে ভূষিত করেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রী লাভ করেন। এবারও পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। জনাব কাশেমের এই কৃতিত্ব সেদিন কিংবা এখনো একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছিল না, সমগ্র চট্টগ্রামে তাতে বিশেষ সাড়া পড়ে যায় এবং তা এখনো আমাদের তরুণ সমাজের কাছে আদর্শের অনির্বাণ শিখা বহন করে এনেছে।

হাউস ফিজিশিয়ানের শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে ড. কাশেম ১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে সরকারী চাকুরিতে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। অবশ্য মাঝখানে সাড়ে পাঁচ বছর তাঁকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর্মি মেডিক্যাল কোরে কাজ করতে হয়। এই কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। অনতিবিলম্বে তাঁকে 'কেপ্টেইন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যুদ্ধে আহত পাক ভারতীয় সৈন্যদলের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। এই সময় থেকে

পরাধীনতা এবং যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তাঁর বদ্ধমূল হয়। অতঃপর জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দানে তিনি সর্বমুহূর্তে সচেষ্ট থাকেন।

পঞ্চাশের দশকে তিনি চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষকতা তাঁর পেশা। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে শহরের অন্যতম সেরা চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নানা সমাজহিতকর কাজে জড়িয়ে পড়েন। তবে এ অধ্যায়ে তাঁর ব্যাপক সাফল্য রাঙ্গুনীয়াবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধিকতর আগ্রহী করে তোলে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ সময়ে ডাক্তারী, কম্পাউন্ডারী বা নার্সিং শিক্ষায় অগ্রণী হলে তাঁর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য লাভ করে।

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি খুলনার সিভিল সার্জন নিযুক্ত হন। প্রায় ছয় বছর যাবৎ কৃতিত্বের সঙ্গে এই জেলায় কাজ করেন এবং সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। অধিকন্তু দু'বছর তিনি খুলনা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর অব হেলথ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই নিবেদিত প্রাণ সিভিল সার্জন খুলনার জনস্বাস্থ্য রক্ষণ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করেন। এটি যে মোটেই অত্যুক্তি নয়, তা বিভিন্ন সময়ের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার উপর নজর দিলেই প্রমাণিত হবে। মোটের উপর, কাশেম সাহেব তাঁর কাজের জন্য খুলনার সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলেই বোঝা যাবে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করেছেন খুলনার দুঃস্থ মানবতার খাতিরে। সদর হাসপাতালে নতুন আটটি কেবিন, রক্তদান কেন্দ্র, শিশুকেন্দ্র, মহিলা সার্জিক্যাল ওয়ার্ড, চালনা পোর্টে নাবিক হাসপাতাল, খালিশপুরের টিবি ক্লিনিক, প্রসূতি কেবিন, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার পাইলট প্রজেক্ট, পরিবার মঙ্গল কেন্দ্র, খালিশপুরের নির্মীয়মান ইন্ডাস্ট্রিয়াল হসপিটাল, সাতক্ষীরায় এক্সরে ইউনিট প্রতিষ্ঠা হয়তো তাঁর একক প্রচেষ্টায় হয়নি, কিন্তু এ সমস্ত পরিকল্পনা তিনিই করেছেন অথবা তিনি উদ্যোগী হয়ে সমাপ্ত করেছেন। এ ছাড়া তাঁর দেশপ্রেমের

অগ্নিপরীক্ষা হয় ১৯৬৫ সালে। ভারতীয় আক্রমণের প্রতিরোধের দিনে তিনি নানা অসুবিধার মধ্যেও খুলনায় সিভিল ডিফেন্স বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সময়ে সামুদ্রিক নোনা পানির প্রভাবে চালনায় পানীয় জলের প্রাদুর্ভাব হয়। জনগণকে দুর্গতি হতে বাঁচাবার জন্য তিনি ডিভিশনাল কমিশনার এবং পোর্ট ডাইরেক্টরের সহায়তায় একটি বিরাট পানীয় জলের রিজার্ভোয়ার প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রামের মানুষের অসুখ-বিসুখ এবং তার চিকিৎসা বিধান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ় এবং অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। এজন্য ঢাকাস্থ ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন তাঁকে বিশেষজ্ঞদের সামনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। তাঁর বক্তৃতা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। বিশেষজ্ঞদের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁর কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

খুলনায় কৃতিত্বপূর্ণ কার্যের পুরস্কার স্বরূপ সরকার তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের ডেপুটি ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস পদে নিয়োগ করেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি চাকুরী জীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেন। অবশ্য প্রদেশে চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে সরকার যে হেলথ স্টাডি গ্রুপ নিয়োগ করেছেন তাঁকে তার সদস্য নিয়োগ করা হয়।

বিরামহীনভাবে তিনি জনগণের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যে পারুয়া ইউনিয়নের সৈয়দনগর ঢেক্ এবং চন্দ্রঘোণার বারগুন্যা খাল খননের স্কীম গৃহীত হয়েছে। এই দুটি কাজে তিনি অসম্ভব রকম খেটেছেন। এই দুটি কাজ শেষ হলে দেশের অসংখ্য মানুষ বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে; চাষের জমি বালি থেকে এবং বন্যার পানি থেকে বাঁচবে।

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া হয়তো এ কাজ দুটো এ বছর আর শুরুই হতো না। সম্প্রতি রোয়াজাহাট মসজিদকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষার ব্যাপারে তিনি সরকারী মহলে চাপ দিতে থাকেন। সুখের বিষয়, সে কাজও এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

শরফভাটা ইউনিয়নে শিকদারপাড়ায় টিউবওয়েল দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সেখানকার অধিবাসীরা পানীয় জলের অভাবে নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে থাকে। কিছুদিন আগে কাশেম সাহেব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে উক্ত গ্রাম সার্ভে করান। আশা করা যায় সরকারের কাছে চাপ দিয়ে এই কাজও তিনি সমাধা করতে পারবেন।

তিনি বিগত বন্যার সময় রাঙ্গুনীয়া থানার দুর্গত এলাকা পদব্রজে ও নৌকাযোগে ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জনগণের দুর্দশার কথা জানাতে সচেষ্ট হন।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে সাহায্য করে আসছেন। এ বছরও অনেক ছাত্র তাঁর সাহায্যে ভর্তি ও বৃত্তিলাভে সমর্থ হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী পরদুঃখকাতর এবং ধর্মভীরু। ১৯৬৫ সালে তিনি পবিত্র হজ সমাপন করেন। মরিয়মনগরে একটি চেম্বারে তিনি সপ্তাহে সাধারণত একদিন বসেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র রোগীদের তিনি বিনা ফিতে চিকিৎসা করে থাকেন।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর আমাদের বিশ্বাস জনসাধারণ কোন রকম ধোকাবাজীতে না ভুলে কেপ্টেইন কাশেমকে ভোট দিয়ে এবং তাঁর পক্ষ সমর্থন করে আমাদের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলবেন। আমাদের একান্ত আশা, এই উপযুক্ত প্রার্থীকে নৌকা মার্কা প্রতীকে সিল মোহর দিয়ে ভোট দিয়ে সবাই রাঙ্গুনীয়া তথা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে আরো বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে সহায়তা করবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অফিস

৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

আমার প্রিয় রাঙ্গুনীয়াবাসী ভাইয়েরা,
আচ্ছালামু আলাইকুম!

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড আপনাদের এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদে জনাব কেপ্টেইন ডাঃ আবুল কাশেম-কে তাঁর যোগ্যতা, ত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও অন্যান্য গুণাগুণের ভিত্তিতে মনোনয়দ দান করেছে। আমার বিশ্বাস, তিনি আপনাদের ভোটে নির্বাচিত হলে বাংলার বঞ্চিত মানুষের দাবী-দাওয়া আদায়ের পথ সুগম হবে।

আমাদের সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত জনগণকে শোষণের অক্টোপাশ ও বন্ধন হতে মুক্ত করে তাদের মুখে হাসি ফুটাবার যে দৃঢ় সংকল্প আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছে আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে আপনি সেই সংকল্পকে বাস্তবায়ন করতে আমাদের সহায়তা করবেন।

আপনাদের উপর আমার আস্থা সীমাহীন। বাংলার সাত কোটি নরনারী তথা সমগ্র দেশবাসী ঐতিহাসিক ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অতীতের নির্যাতিত দিনগুলোর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। যেদিন আয়ুবশাহী আমাকে ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে দেবার জন্যে মেতেছিল, সেদিন আপনারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কেবল সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং বুলেট্, বেয়োনেট, কালাকানুন অগ্রাহ্য করে আমাকে বন্দীশালা হতে ছিনিয়ে এনেছিলেন। আমি আপনাদের সে ঋণ হয়ত কোনদিনই পরিশোধ করতে পারব না। তবে আগামী সাধারণ নির্বাচনে আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে যদি আমার হাত শক্তিশালী করেন তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমার সাধ্যানুযায়ী আপনাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

আপনাদের উপর আমার ভরসা আছে। আপনারাই আমার সাহস ও শক্তি – জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে আমি আপনাদের নিকট সকল প্রকার সাহায্য পাব বলে আশা রাখি।

আমরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছি। নিশ্চয়ই খোদা আমাদের সহায় হবেন।

আপনাদেরই
শেখ মুজিবুর রহমান

ডা. আবুল কাসেম
[১৯৭০ সালের নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদের ছবি]

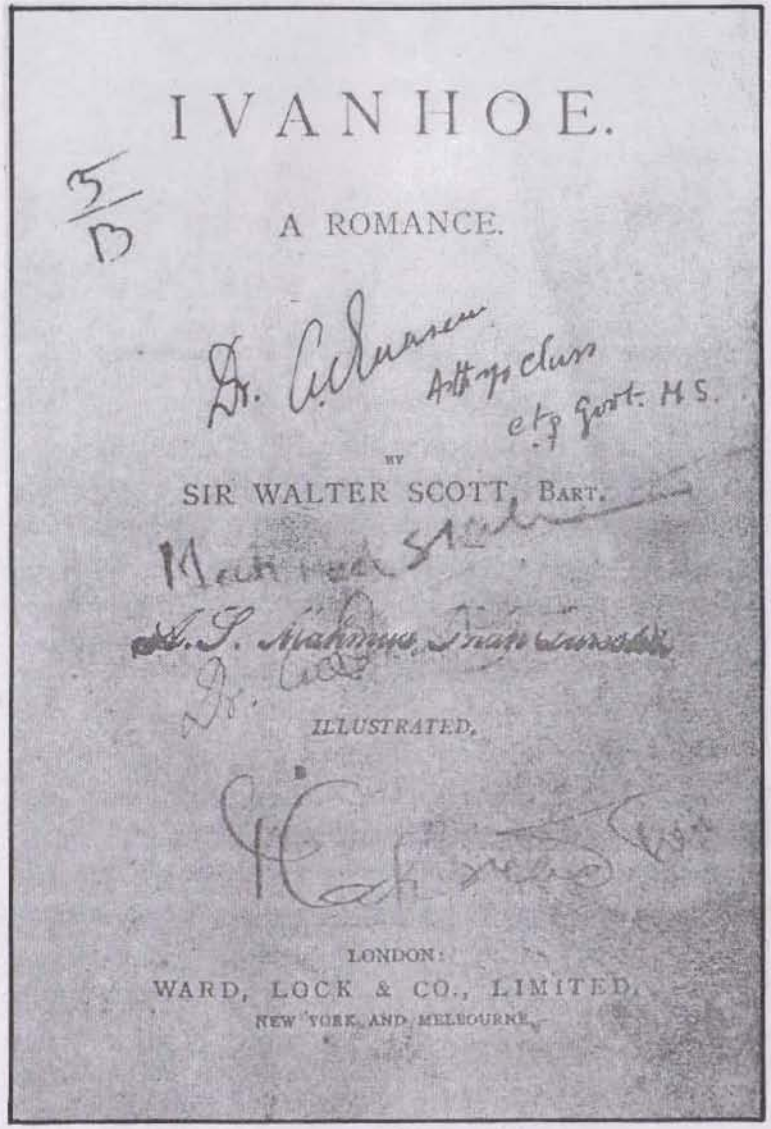

IVANHOE.

A ROMANCE.

BY

SIR WALTER SCOTT, BART.

ILLUSTRATED.

LONDON:
WARD, LOCK & CO., LIMITED,
NEW YORK AND MELBOURNE.

ছাত্রাবস্থায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই।

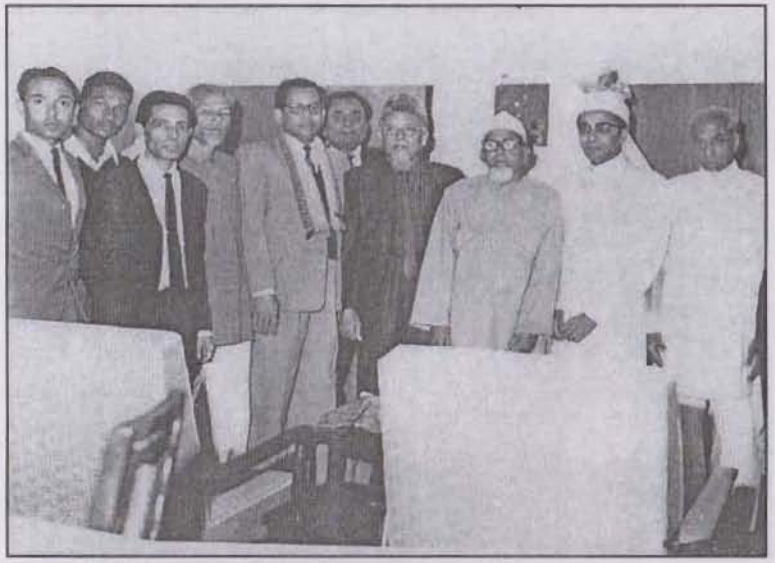

ড. কোরেশীর বিবাহ (২৭.১২.১৯৭০) উপলক্ষে তাঁর দেবপাহাড়ের বাসায় সম্মিলিত স্বজনদের মধ্যে ডা. আবুল কাসেম। ডান দিক থেকে : বাবা রফিক আহমদ, বর, চাচা ফরিদ আহমদ, বড় মামা, গ্রন্থাগারিক শামসুল আলম মামা, বর্তমানে বিস্মৃত এক স্বজন, গ্রাম সুবাদে আত্মীয় সুলতান দাদা, কাজিন ডা. সবুর, কাজিন মফিজ, ছোটভাই জহির শাহ।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে বড় মামা।

বড় মামী ও প্রথম নাতনী জুলি [১৯৭০]

বড় মামী, নাতনী ও একমাত্র ছেলে মাহবুবুল আলম ঢাকার
সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসের বাসভবনে [১৯৭০]